# মানবাধিকার (Human Rights)

## আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত (International Context)

রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অথবা রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন মানবসামজের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই এতদিন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি স্থির করা হত। যুদ্ধ-শান্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুঁজি-প্রযুক্তি, পর্যটন-পর্যবেক্ষণ সর্বস্তরেই আন্তর্জাতিক আইন বা কূটনীতির প্রান্ত-রেখা রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে এসেছে। কিন্তু যেসব ব্যক্তি-মানুষ বা গোষ্ঠী-মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্র, অথবা যাদের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, তাদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তাভাবনা করা অর্থাৎ তারা যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুধু অঙ্গীভূত নয়, বিশেষ মনোযোগের দাবিদার—এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালে। বলা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক চেতনার প্রসার, ব্যাপকতর যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র রচনা এবং রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে নানা প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি উদ্যোগ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা

প্রসঙ্গত ভারত সরকার এইসব চুক্তির অনেকগুলিরই শরিক, সমর্থক ও উদ্যোক্তা। সন্ত্রাসদমনের প্রয়োজনেই ভারত সরকার POTA (Prevention of Terrorist Activities) আইন[৪২] চালু করেছিলেন। আর এবিষয়ে UN Working Group-এর কাছে একটি বিস্তারিত Draft Conventionও পেশ করেছেন।

মূলত নিজ নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এবং আইনের অধীন হলেও তাদের ওপর রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব যে স্বৈর শাসনের সমার্থক নয়—এই রাজনৈতিক বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হতে থাকে। ফলে, একদেশের নাগরিকবৃন্দ অথবা তাদের অংশবিশেষ যদি রাষ্ট্রীয় অবিচার-অত্যাচারের শিকার হয়, তাহলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের সে বিষয়ে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনে নিপীড়িত মানুষের কষ্ট নিবারণে বাইরের হস্তক্ষেপ যে অবৈধ নয়, বরং সমর্থনযোগ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদারপন্থী আলোচনায় এই মনোভাব স্বীকৃতি লাভ করে। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রামে মানবাধিকার রক্ষা একটি বিশ্ব-মতাদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। বস্তুত পশ্চিমি রাষ্ট্রদর্শনের উদারনৈতিক ঐতিহ্য, যা খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে, সেখানে রাষ্ট্র-বনাম-ব্যক্তি সংক্রান্ত বিতর্কে ব্যক্তিগত অধিকারগুলি সংজ্ঞায়িত ও সুরক্ষিত করার প্রয়াস অচিরেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে থাকে। এমনকি কোনো কোনো উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিদেশনীতি নিরূপণে মানবাধিকার একটি বিশেষ মাত্রা হিসেবে সংযোজিত হয়। এর গূঢ় উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর ব্যক্ত উদ্দেশ্য মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করতে বাইরের শক্তিকে নিয়োগ করা। ফলত, মানবাধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এক সমান্তরাল আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

## মানবাধিকারের বিবর্ধমান ভিত্তি (Expanding base of human rights)

মানবসভ্যতার মূল প্রত্যয় হল সমস্ত মানুষই জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং সমান মর্যাদা ও অধিকারের পাত্র। মানবাধিকার আসলে মানবকল্যাণ এবং মানুষের মর্যাদাকে (human welfare and human dignity) নিশ্চিত করার বিষয়। এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত এবং প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের ফলশ্রুতি। সুনামের অধিকারী সমস্ত প্রাচীনসভ্যতাই মানুষের জয়গানে মুখর—ভারতবর্ষ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে আপাত-বৈচিত্র্য এবং ব্যবহারিক বৈষম্যের গভীরে গিয়ে প্রতিটি মানুষকেই পরমশক্তির আধার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার শাশ্বত বাণী। সকল জীবে করুণা ও মৈত্রীর মনোভাব জাগ্রত করার সুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে সর্বকালে সব ধর্ম আন্দোলনে। পশ্চিমি সভ্যতায় আরও পরবর্তীকালে—বিশেষত পুনর্জাগরণ (renaissance) কালে—'সবার উপরে মানুষ সত্য' (man is the measure of everything) এই মতাদর্শ প্রচারিত হয়। অবশ্য তার লক্ষ্য যত না মানব-কল্যাণ, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তি মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

সমাজে শান্তি স্থাপন এবং মানুষের মঙ্গল সাধন প্রথমে রাষ্ট্র ও সমাজের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গৃহীত হত। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার একমাত্র মূল্য ছিল গণরোষ,

জনসমর্থন প্রত্যাহার ও বিদ্রোহ। কালক্রমে রাষ্ট্রীয় শাসন ও শাসিত মানুষের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেইভাবেই দেশের আইন ও সংবিধানে রাষ্ট্রের পক্ষে কী করণীয় এবং কী নিষিদ্ধ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কী তার প্রাপ্য এবং কী তার কর্তব্য, এই বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এ নিয়ে উনিশ ও বিশ শতকব্যাপী জাতীয় স্তরে বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, নারী-শিশু-সংখ্যালঘু ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থ এবং সর্বোপরি, মানুষের সংঘবদ্ধ অস্তিত্বের জন্য আর্থ-সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা মানবাধিকারের অঙ্গীভূত বলে গণ্য হয়। এক জাতির ওপর অন্য জাতির ঔপনিবেশিক শাসনকেও মানবাধিকার বিরোধী বলে মনে করা হতে থাকে। বস্তুত মানবাধিকারের ইতিহাসই হল অধিকারের ধারণাটির ক্রমসম্প্রসারণ এবং সুনিশ্চিত সংরক্ষণের জন্য প্রয়াসের ইতিহাস। মানবসমাজে মূল্যবোধের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে মানবাধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই অর্থে মানবাধিকারের প্রশ্নটি কেবলমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুযোগ আদায়ে সীমাবদ্ধ নয়; তার তাৎপর্য বৃহত্তর মানবকল্যাণের বিষয় বলে পরিগণিত। সুতরাং শুধু রাষ্ট্র নয়, অন্য সব সত্তা ও সংস্থা যার ওপর মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে, সেসবই মানবাধিকার আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

এই ক্রমপ্রসারণশীল আন্দোলনের সূত্রপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলায়। সে সময় ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিকটতম প্রকাশ ঘটেছিল মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণে, ব্যক্তি-মানুষের মর্যাদার নির্লজ্জ লঙ্ঘনে এবং উৎপীড়নের নৃশংসতায়। সুতরাং যুদ্ধ শেষে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্তই ছিল মানবাধিকার রক্ষার সর্বাত্মক প্রতিশ্রুতি।[৪৩] সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (UN) তাই মানবাধিকার ও মানবমর্যাদাকে সংরক্ষণের দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। সনদের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে শুধু 'পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্তি দেওয়াই' নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার, আত্মমর্যাদা, মূল্যবোধ ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা ফিরিয়ে আনা। কারণ যুদ্ধের অবসান স্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি দেয় না, যদি না সেইসঙ্গে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের নিশ্চয়তা থাকে।[৪৪] জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে তাই অন্যতম লক্ষ্য হল মানবাধিকার, তথা জাতি, লিঙ্গ, ভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষভাবে মৌলিক স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ মানবাধিকারের বিষয়টি আর জাতি-রাষ্ট্রের একান্তভাবে নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়ে রইবে না। এজন্য আন্তর্জাতিক প্রয়াস হবে অপরিহার্য। এই দায়বদ্ধতা থেকেই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ধারণাটিকে মূর্ত করে তোলা এবং তার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি আদায় করার জন্য ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ

সভায় গৃহীত হয়েছিল 'মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র' (Universal Declaration of Human Rights)।[৪৫] পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎকর্ষ সাধনে এই ঘোষণাপত্রটি মূল দিশারি হিসেবে স্থায়ী গুরুত্ব অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রায় আশিটিরও বেশি মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি, আইন অথবা সনদ প্রণীত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলিই জাতীয় আইনব্যবস্থার মাধ্যমে স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়ে চলেছে।

১৯৪৮ সালে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় যে অধিকারগুলি উল্লিখিত হয়েছিল, তার আইনগত রূপ নির্দিষ্ট করার জন্য ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় দুটি মানবাধিকার চুক্তি (Covenant) গৃহীত হয়—একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) এবং অন্যটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Civil and Political Rights)। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকল যুক্ত হয়। সামগ্রিকভাবে এই সনদ, চুক্তি ও প্রটোকল নিয়ে International Bill of Human Rights গঠিত হয়েছে।

বিবর্তনের দিক থেকে বিবেচনা করলে উল্লিখিত অধিকারগুলিকে প্রথম প্রজন্মের অধিকার (first generation rights) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারই প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের অনুশাসন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ইত্যাদি কারণে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবিধান, অপরাধীর সুবিচার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইত্যাদি এই শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে পড়ে। এগুলির চরিত্র প্রধানত নিষেধাত্মক—অর্থাৎ রাষ্ট্রকে কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে নিবৃত্ত করা। নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ার (domestic jurisdiction) অক্ষুণ্ণ রেখে এইসব নিষেধ মান্য করায় অসুবিধা হয়নি সেইসব রাষ্ট্রের বহিরঙ্গের দিক থেকে যারা গণতান্ত্রিক (formal democracy)। পক্ষান্তরে যেসব রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক অথবা সর্বাত্মক (totalitarian), সেখানে এইসব রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োগে সংকোচন ঘটেছে।

এর পাশাপাশি রয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি (second generation rights) যার মূল লক্ষ্য নাগরিকদের পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলির স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্পষ্টতই ইতিবাচক—অর্থাৎ কতকগুলি কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্রকে তৎপর হতে হয়। এই অধিকারগুলি সেই অর্থে কেবলমাত্র নিবারণমূলক বা নিষেধাত্মক নয়, এদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, উপযুক্ত কর্মসংস্থান, উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, ব্যক্তিগত সম্ভাবনা বিকাশের

উপযোগী সহায়সম্বল ও পরিবেশ সৃষ্টি, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিপোষণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হয়। কেবলমাত্র ঘোষণার দ্বারা নয়, সামাজিক ন্যায় বিধান ও জনকল্যাণের যথার্থ উদ্যোগ এই দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য একান্ত অপরিহার্য। বলাবাহুল্য, একমাত্র সমাজবাদী কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই এই ধরনের অধিকারের পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব। অন্যত্র, এগুলির প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে শাসকশ্রেণীর ইচ্ছাধীন—যে কারণে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতার বাতাবরণ থাকলেও অর্থনৈতিক সাম্য ও জনকল্যাণের কোনো বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না। বস্তুত অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পালন করা সম্ভব নয়। সেই কারণে অনেক রাষ্ট্রই অধিকার সংক্রান্ত দ্বিতীয় চুক্তিপত্রে অনুমোদন জ্ঞাপন করেনি।

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি এইভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে থাকায় আরও নানা অধিকার যে অর্জনযোগ্য, এই বিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে এবং অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে থাকে। শুধুমাত্র জীবনধারণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী কতকগুলি অধিকার নয়, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার স্বার্থে আরও অনেক নতুন ধরনের অধিকার অগ্রাধিকার দাবি করছে। এইগুলিকে তৃতীয় প্রজন্মের (third generation) অধিকার বলে গণ্য করা যেতে পারে। লক্ষ করার বিষয় এই যে, ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সমষ্টিগত অস্তিত্ব ও উন্নয়নের জন্য এই ধরনের অধিকারগুলি (Communitarism rights) ক্রমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। গত শতকের ষাটের দশকে উপনিবেশবাদের অবসান, পরমাণবিক অস্ত্রের প্রসার, শিল্পায়নে ও কৃষি উৎপাদনে প্রযুক্তির অবিরত ব্যবহার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদির ফলে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—কোনো কোনো শ্রেণীর মানুষের পক্ষে তার পরিণাম হিতকর হয়নি। সদ্য স্বাধীন যেসব দেশে বিবিধ মানবগোষ্ঠীর সমাবেশ, সেখানে তাদের নিজস্ব সত্তা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা রক্ষা ক্রমেই জরুরি আকার ধারণ করছে। অবিমিশ্র উন্নয়ন ও যত্রতত্র শিল্পায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হওয়ায় অনেক উপজাতি ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে অথবা তাদের সাবেক জীবন ও জীবিকার ওপর আঘাত আসছে। পরমাণু শক্তির অপপ্রয়োগ ও জৈব রাসায়নিক দূষণের ফলে সুস্থ জীবনযাত্রায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত এবং / অথবা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যারা সন্ত্রস্ত তাদের তরফে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে নানাধরনের আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। পশ্চিম জগতে সবুজায়ন ও শান্তিসূচক আন্দোলন (Green Peace Movement) এর একটি বিশেষ নিদর্শন। অন্য দিকে তৃতীয় দুনিয়াতেও নয়া উপনিবেশ বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী, পরিবেশ দূষণ বিরোধী নানা সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে। সরকারি অকর্মণ্যতা বা উদাসীনতার প্রেক্ষিতে বেসরকারি সংস্থাগুলি এইসব ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

এছাড়া জাতীয় সমাজের মধ্যেই বিদ্যমান বৈষম্যের অন্যতম একটি ক্ষেত্র হল নারী-জাতির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার অভাব। বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলন সমাজের এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

বহুমাত্রিক, বহু উদ্দেশ্যমুখী এইসব আলোড়নের ফলশ্রুতি নব প্রজন্মের একগুচ্ছ অধিকার যার প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছে। অধিকারের ধারণা এইভাবে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে—বিশেষ করে গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। স্টকহোমে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন (১৯৭২), রিও-তে বসুন্ধরা সম্মেলন (১৯৯২), কোপেনহ্যাগেনে সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫), বেইজিংয়ে নারীর অধিকার সংক্রান্ত আলোচনাচক্র (১৯৯২), নবযুগের এই অধিকার সচেতনতার এক একটি দিক নির্দেশক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন অধিকারের ঘোষণাপত্র থেকে যে আন্দোলনের শুরু, ১৯৯৫ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার মহাসম্মেলন পর্যন্ত তার একটানা অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। একটি সময় ছিল যখন মানবাধিকার কী এবং তার কতখানি রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তাই নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। এখন অধিকার চেতনা এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে, এ বিষয়ে যতই বিতর্ক থাকুক, অধিকারের প্রকৃতি ক্রমেই ব্যাপকতর রূপ নিচ্ছে এবং তার স্বীকৃতি বেশি দিন স্থগিত রাখা যাচ্ছে না।

এই প্রেক্ষিতে মানবাধিকারের সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া প্রয়োজন যাতে অধিকার-সংক্রান্ত আন্দোলনের বহুমুখী দিকগুলির যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। মানুষের সর্ববিধ বিকাশের যা সহায়ক হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি, মানুষে-মানুষে সুসম্পর্কের অনুকূল পরিস্থিতি যার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের পাশাপাশি ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা যাতে ফলপ্রসূ হতে পারে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যাতে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে বর্তমান যুগে মানবাধিকারের সেইটিই হবে যথার্থ পরিচয়। মানবাধিকার দেশকালে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সর্বজনীন ধারণা। সারা বিশ্বের মানুষের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত দাবির এ হল সংহত রূপ।

## মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি (Human Rights and International Politics)

মানুষের জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য, অস্তিত্বের স্বাধীনতা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হলেও মানবাধিকারের বিষয়টি রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়। যদিও বৃহত্তর অর্থে অধিকার-বোধের উৎপত্তিস্থল সমাজজীবন, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ওপর নির্ভর করে তার বহিঃপ্রকাশ। মানুষের অনেক অধিকারই রাজনৈতিক ব্যবস্থার আনুকূল্য ছাড়া বাস্তবায়িত হতে পারে না—যে কারণে মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশই

রাজনৈতিক অধিকার। কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্যই রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োজন।

এতদিন পর্যন্ত একমাত্র জাতীয় রাজনীতিকেই অধিকার আন্দোলনের একমাত্র ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়েছে। ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী তাদের নিজের নিজের রাষ্ট্র কর্তৃত্বের থেকেই অধিকার আদায় করে নেবে এবং জাতি-রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে সেই অধিকারের প্রয়োগ—এই ছিল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের সম্প্রসারণ যতটা প্রত্যাশিত, সব রাষ্ট্রে ততটা অগ্রগতি ঘটে না; বরং নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে অধিকারের তারতম্য লক্ষিত হয় এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে। স্বীকৃত মানবিক অধিকারগুলির লঙ্ঘন ও সংকোচনের ঘটনা ঘটতে থাকে। এর ফলে বঞ্চিত ও উৎপীড়িত মানুষের সমর্থনে অন্যান্য প্রাগ্রসর সমাজের মানুষের সহমর্মিতা জাগ্রত হয় এবং অধিকার রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। এইভাবেই দেখা গেছে ঔপনিবেশিক দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের কঠোর বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার (apartheid) বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠিত হতে এবং সেই জনমতেরই প্রকাশ ঘটেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বর্ণবিদ্বেষ ও তার স্রষ্টা ঔপনিবেশিক সরকারের উৎখাতে। একইরকমভাবে ইজরেয়লি সরকারের আগ্রাসন ও সশস্ত্র দমনপীড়নের শিকার, নিজভূমে পরবাসী প্যালেস্তিনীয় আরবদের স্বাধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে হয়েছে আন্তর্জাতিক সমাজকে।

আবার দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ক্লিষ্ট, অর্ধাহারে মৃতপ্রায় আফ্রিকাবাসী সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, রোয়ান্ডার অসহায় মানুষের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ছাড়া কোনো উপায়ান্তর ছিল না। কিংবা, রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা গৃহযুদ্ধের ফলে স্বদেশত্যাগী শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও রাজনৈতিক অধিকারের পুনরুদ্ধার একমাত্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছে যেমন দেখা গেছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত কাম্বোডিয়ায়, আফগানিস্তানে, বসনিয়ায়, অ্যাঙ্গোলায়, অথবা মায়ানমারের জঙ্গি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে।

যেসব পরিস্থিতির উল্লেখ করা হল, সেখানে দেখা গেছে আন্তর্জাতিক বিবেক আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রবুদ্ধ করেছে মানবিক ভূমিকা গ্রহণে। স্বভাবতই এ ধরনের রাজনীতি সুযুক্তি-প্রসূত এবং স্বাগত, যদিও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পক্ষপাত ও ত্রুটি-বিচ্যুতি একেবারে এড়ানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ-কেন্দ্রিক পক্ষপাতমূলক রাজনীতিও যে মানবাধিকারের বিষয়কে সংক্রামিত করে থাকে, সেদিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

বলাবাহুল্য, মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রথম পর্যায়ে সমগ্র আন্তর্জাতিক উদ্যোগই ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাবান্বিত। দুই বিরুদ্ধবাদী শিবিরের মতাদর্শগত সংঘাতের অশুভ ছায়া পড়েছিল জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রয়াসের ওপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা

পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারকে উপেক্ষা করেছে এবং সচেতনভাবে তাদের বিদেশনীতিতে মানবিক সাহায্য (humanitarian aid) দেওয়া হয়েছে একমাত্র তাদের শিবিরভুক্ত ও সমর্থক রাষ্ট্রগুলিকে। ঔপনিবেশিক স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ এই দেশগুলি কদাচিৎ উপনিবেশ-মুক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে (উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষে গোয়ার মুক্তি আন্দোলন অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় নামিবিয়ার স্বাধীনতার বিষয় উল্লেখযোগ্য)। বরং দেখা গেছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েও এইসব দেশের নেতৃত্বের সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল এবং এখনও রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক মহলের প্রতি। ফলে সেসব দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দমনপীড়ন ও নির্যাতনের বহুবিধ দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও সামরিক-কূটনৈতিক আঁতাত বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমি গণতন্ত্রগুলি নিশ্চেষ্ট থেকেছে। ফ্রাঙ্কোর আমলে স্পেন, জঙ্গি শাসনাধীন লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, পাকিস্তান সহ পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশ এর উদাহরণ। এমনকি খোদ মার্কিন দেশেও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অধিকার সংকোচন দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় থেকে মুক্ত ছিল না। যে-কারণে পশ্চিমি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত কয়েকটি রাজনৈতিক অধিকার প্রদানে ঐ তরফে যথেষ্ট অনীহা ও প্রতিরোধ দেখা গেছে। খাস সোভিয়েত দেশে তো বটেই এবং সোভিয়েত প্রভাবিত পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিনিময়ে বহুলাংশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। স্বভাবতই সোভিয়েত শিবিরভুক্ত দেশগুলিতে মানবাধিকারের অভাব পশ্চিমি দুনিয়ার কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার যন্ত্রের প্রধান উপজীব্য ছিল। অবশ্য সোভিয়েত শাসনের শেষের দিকে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা (internal dissidence) প্রকাশ্যে চলে আসে এবং গোর্বাচেভ প্রবর্তিত স্বচ্ছতার (glasnost) বাতাবরণে বিস্তৃত হতে থাকে সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপে।

ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রাবল্য ছিল সর্বজনীন অধিকার প্রসারে বিশাল প্রতিবন্ধক। সে সময় বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে পছন্দসই দেশগুলিতে সাহায্য প্রেরণ এবং শত্রু পক্ষের দেশগুলির প্রতি বিমুখতা অবশ্যই কূটনীতির স্বাভাবিক (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত) রীতি অনুসরণ করেছে।

আবার ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করায় ওয়াশিংটন থেকে ভারতকে প্রতিশ্রুত সাহায্যদান স্থগিত রাখা হয়, যদিও পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের সমর্থন ও আর্থিক-সামরিক মদতদানে কোনো কুণ্ঠা দেখা দেয়নি।

অন্যদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, শুধুমাত্র এই কারণে সাহায্য প্রত্যাহার করা এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা তুলনামূলকভাবে

সাম্প্রতিককালের লক্ষণীয় ঘটনা। চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তথা বাণিজ্যিক স্বার্থে যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে এক স্থায়ী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে উভয় দেশের মানবাধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। চীনে বাজারমুখী সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটানো হলেও, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা বিন্দুমাত্র শিথিল করা হয়নি। তরুণ প্রজন্মের বিদ্রোহ দমনে তিয়েনানমেন চত্বরে (১৯৮৯) যে ব্যাপক বলপ্রয়োগ করা হয়, তার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসন দীর্ঘকালীন বাণিজ্যিক কড়াকড়ি চালু করে এবং চীনকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত (MFN) দেশের মর্যাদা দানে বিলম্ব ঘটায়। তা সত্ত্বেও চীন তার অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি। এ বিষয়ে তার দ্বিধাহীন বক্তব্য কতকগুলি অধিকার যেমন সর্বজনীন, অনেক অধিকারই আবার জাতীয়-সংস্কৃতি নির্ভর (national culture-specific)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির সমালোচনা বা হস্তক্ষেপ তাই চীন কোনোভাবেই বরদাস্ত করে না।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বরাজনীতির একমেরুকরণের প্রেক্ষিতে মানবাধিকারের প্রশ্নটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক মাত্রা পেতে চলেছে। প্রথমত, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক বা অন্য কোনো ধরনের বিকল্প না থাকায়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে গ্রহণযোগ্য অধিকারগুলিই প্রাধান্য পাচ্ছে; সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি গৌণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত, একমেরুকৃত দুনিয়ার প্রবলতম শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই স্থির করে দিচ্ছে কোন্ দেশের মানবাধিকার রেকর্ড কতখানি অনুমোদনযোগ্য। অন্যথায় অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে বিশেষ কয়েকটি দেশ, যেগুলি আবার ঐতিহাসিক কারণে মার্কিন স্বার্থের অনুগামী নয়। ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (rogue state) রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের পথিকৃৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অতি-উন্নত পশ্চিমি দেশগুলি বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানবাধিকারকে একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পেশ করেছে। বিশেষত, উন্নয়নশীল দেশসমূহে শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থায় কাজ করতে হয় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয় এই অজুহাতে পশ্চিমি দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানির ওপর বাধানিষেধ জারি করে চলেছে। যদিও মুক্তবাণিজ্যের মূলনীতির সঙ্গে এইসব ওজর-আপত্তি একেবারেই সঙ্গতিহীন ও অপ্রাসঙ্গিক, তবু বিশ্ব অর্থনীতির ওপর পুঁজিবাদী দেশগুলির একচ্ছত্র আধিপত্যের দরুন এই ধরনের বিরক্তি উৎপাদক বিষয়ও আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে, স্বভাবতই উন্নত ও উন্নয়নশীল দুনিয়ার মধ্যে অকারণ বিরোধের সৃষ্টি হতে থাকে। অন্যদিকে মেধাসম্পদের (intellectual property) অধিকার নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ; জ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর মানুষের সাধারণ অধিকার এর ফলে সংকুচিত হচ্ছে।

মানবাধিকারের প্রশ্নে ঠান্ডা লড়াই-উত্তর পর্বে সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয় আতঙ্কবাদ। বলাবাহুল্য আতঙ্কবাদ সন্ত্রাসবাদেরই নামান্তর, যে-কোনো আকারেই সেটা মানবাধিকারের পক্ষে মারাত্মক।[৪৬] বর্তমান বিশ্বে এটি এমন জটিল রূপ নিয়ে নানা স্থানে মাথাচাড়া দিচ্ছে যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তথা সুস্থ নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কবাদীর কাছে মানবিক মূল্যবোধ আশা করা বৃথা। ধ্বংসকামিতাই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। অথচ আতঙ্কবাদী গোষ্ঠী বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ ও শাস্তিদান ভিন্নতর এক অভিযোগ তোলে, যার নাম রাষ্ট্রীয় আতঙ্কবাদ (state terrorism)। আতঙ্কবাদের প্রাথমিক শিকার নিরীহ মানুষ; আতঙ্কবাদ দমনে সরকারি নিবর্তন ও বলপ্রয়োগের চাপও সহ্য করতে হয় তাদেরকেই। এজন্য আন্তর্জাতিক জনমত এখনও সুস্পষ্ট কোনো বিচারে পৌঁছতে পারছে না। তবে আতঙ্কবাদ দূর করা না গেলে মানবাধিকার যে তার অর্থ হারায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষেই কাশ্মীর উপত্যকায় বিগত দুই দশকের অধিককাল ব্যাপী সন্ত্রাসের যে বীভৎস রূপ দেখা গেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী আজও তা নির্মূল করতে সক্ষম হয়নি। উপত্যকার মানুষই শুধু বিপন্ন নয়; উপত্যকা থেকে বিতাড়িত কয়েক সহস্র কাশ্মীরী পণ্ডিতের স্থায়ী ঠিকানা এখন শরণার্থী শিবির। তার ওপর অবিসংবাদিত প্রমাণ রয়েছে উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদের পিছনে সীমান্তপারের মদত ও উস্কানির। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান সমগ্র ব্যাপারটি মুক্তি আন্দোলনের চেহারা দিতে চাইলেও, সন্ত্রাস রপ্তানির কাজে সে দেশের ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। সুতরাং আতঙ্কবাদের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ জড়িত একথা অস্বীকার করার নয়। আতঙ্কবাদের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ জড়িত হয়ে রয়েছে কাশ্মীর পরিস্থিতিতে। অথচ, পারমাণবিক অস্ত্রগত প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় সেখানে স্থিতাবস্থার বাইরে কোনো পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাগ্রস্ততা রয়েছে।

এই যুক্তি অবশ্য মহাশক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ (৯/১১ সংখ্যায় যা সংক্ষেপিত) মার্কিন দেশের অভ্যন্তরে নিউ ইয়র্ক বাণিজ্য মিনারের ওপর ইসলামি মৌলবাদী সংস্থা অল্-কাঈদা নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিধ্বংসী বিমান হানার পর থেকে মার্কিন প্রশাসন সহায়ক কয়েকটি দেশের (প্রধানত ব্রিটেন ও পাকিস্তান) সঙ্গে একযোগে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাকে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ চালায়। নির্বিচার ধ্বংসলীলার পর দুই দেশেই মার্কিন অনুমোদিত সরকারও স্থাপন করা হয়। একযোগে আতঙ্কবাদ ও মারণাস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসন অবশ্য জাতিপুঞ্জ অনুমোদিত হতে পারেনি। আতঙ্কবাদ শুধুমাত্র আধুনিক পশ্চিমি দেশেই নয়, রাশিয়ার চেচনিয়া প্রদেশে এমনকি কিয়দংশে চীনা ভূখণ্ডেও অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে। ফলত, আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধেই এখন বিশ্বজনমত সক্রিয়।

তবে আতঙ্কবাদের সম্ভাব্য আক্রমণের অজুহাতে ঐ সব দেশে স্বাভাবিক মানবাধিকারের ওপর যে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে, দেশপ্রেমের নামে সর্ববিধ আক্রমণাত্মক সরকারি প্রয়াসকে যেভাবে সমর্থনে বাধ্য করা হচ্ছে অথবা বিদেশি নাগরিকদের ওপর যেসব বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু হয়েছে—জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে সেটা কতখানি সমর্থনযোগ্য সে বিষয়ে ঐসব দেশের বিরোধী রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশেষত 'ইরাকে' প্রতিশোধমূলক মার্কিন আক্রমণের পর আক্রান্ত দেশের সাধারণ জনজীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর যে বেপরোয়া অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এ সন্দেহ অমূলক নয় যে এক-মেরুকৃত নয়া বিশ্বজমানায় মানবাধিকারের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে থাকবে মার্কিনী আচরণের সংযম অথবা অসংযম এবং অবশ্যই একদেশদর্শিতার ওপর। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিশ্বজনমত গঠনে মাঝারি ও ছোটো মাপের দেশগুলির ভূমিকা এখনও স্পষ্ট নয়।

## তথ্যসূত্র

১. প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী গরিব দেশগুলিতে জন্মহার কমে দাঁড়িয়েছে হাজারে ৩০ (১৯৯০) যা ১৯৬৫ সালে ছিল হাজারে ৪২ জন। পক্ষান্তরে ধনী দেশগুলির জন্মহার হাজারে ১৩-র বেশি নয়।

২. UN G. A. Resolution *on NIEO* (1974).

৩. Rio *Earth Summit,* 1992.

৪. UN Conference on the Laws of the Seab. (1982 enforced 1994).

৫. *Our Global Neighbourhood*—UN Commission on Global Governance.

৬. অর্থনীতিবিদ্ Samuelson বলেছেন Poor countries need not find modern Newtons to discover the laws of gravity...nor do they have to repeat the slow, meandering route to industrial revolution"—*Economics* p. 597, Tata McGraw Hill, N. Delhi 2001.

৭. *Human Development Report,* 2000, OUP for UNDP. pp. 157-159, 202.

৮. সাবেক মাকর্সীয় তত্ত্বের ভিন্নতর উপস্থাপন দেখা যায় ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ J. A. Hobson, জার্মান মাকর্সীয় চিন্তক Rosa Luxemburg ও Hilferding এবং Joseph Schumpeter-এর লেখায়। V. I. Lenin-এর Imperialism, the Highest Stage of Capitalism এ বিষয়ে তুলনীয়।

৯. এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পরনির্ভরতার (dependency) তত্ত্বটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১০. Max Weber (1864-1920); *Protestant Ethics and Rise of Capitalism.*